ভূমিকা

রেনেসাঁ এই ফারসী শব্দটির অর্থ পুর্নজন্ম। জীবন ও ঐতিহ্যের নবজন্মলাভই রেনেসাঁ শব্দের মূলগত অর্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নতুন যুগের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ বিভিন্ন সাহিত্যশাখাকে সমৃদ্ধ করেছে আর এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বহন করে নিয়ে এল romantic imagination এর যুগ। এই যুগেই বাঙালীর জীবন ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে চৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটে গেল, তার সবটাই প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন সাহিত্যে। এই যুগধর্মকে স্মরণে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্র রচনা করলেন। সমাজ, ধর্ম, মনন সমস্ত কিছুকে নিজের কক্ষপথে টেনে এনেছিলেন। উনিশ শতকে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় - "বঙ্কিমচন্দ্র আনলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত, লায়লা মজনুর হাঁতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতি কালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে?" (উপন্যাসের কথা/দেবীপদ ভট্টাচার্য) সামাজিক সমস্যাকেও ধীরে ধীরে তাঁর সাহিত্যের বিষয় করলেন। আর রাজনীতি বা রাজনৈতিক সমস্যাকে উপন্যাসে প্রথম স্থান দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে, ১৯১০ সালে। বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলাদেশের বুকে বহু রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের সমাজ মানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৫ এ বাংলাদেশের দেশব্যাপী আলোড়ন এবং বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' রচনার উৎসভূমি। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' যে দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই প্রসারিত করে 'গোরা' উপন্যাস রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। গোরার সমস্যা ব্যক্তিজীবনের সমস্যা হলেও একটা জাতীয় চেতনার মূল বিদ্যমান। রাজনৈতিক আন্দোলন ধীরে ধীরে বিপ্লববাদের পন্থায় পরিণত হয়। এরই পাশাপাশি ১৯১৪ সালে জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ বছরই 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের যুগান্তর সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ঘরে বাইরে'। ১৯৩৪ সালে যখন ইউরোপে শোনা যাচ্ছে ফ্যাসিজমের পদধ্বনি, স্বদেশ ও বিদেশের নানা ঘটনায় আলোড়িত হয়ে তিনি লিখেছেন 'চার অধ্যায়', বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিসম্পর্কের দ্বন্দ্বে উপন্যাসটি কালোত্তীর্ণ হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম দুটো দশকে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র লিখলেন রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যখন নতুন পথ নির্মাণ হচ্ছে ঠিক সেই সময়টিকে আত্মস্থ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ পড়ার সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরপর অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনের

সক্রিয় কর্মীরূপে দু বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হন। 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' রচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে অভিভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন - "ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী'তে নতুন করে সেই কথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ... রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্ণিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, মানুষের সনাতন জীবন মুক্তির সাধনা। . . . সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামকে অনুভব করেছিলাম আমি।" (Ref. মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে/অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৯-৪০)

উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার চর্চার পাশাপাশি পুরাণের পুনর্নবীকরণ ঘটেছে। আসলে পুরাণকে অনেক সময়ই সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি বলে মনে করা যায়। একদিকে বিলাতি আচারের ও নাস্তিকতার নেশায় অন্যদিকে তারই প্রতিক্রিয়ায় নব্য হিন্দুধর্মের বিচারবিহীন উচ্ছ্বাসে যখন দেশ উদ্‌ভ্রান্ত তখনই বঙ্কিম চন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় পুরাণের অনুসৃতি। মানুষের ইতিহাসে যৌথ অবচেতন বা সামূহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে মিথের আদিমতম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে আর তার চেতন মানসিকতায় সেগুলিকে ব্যক্ত করা হয় একেকটি গল্পের মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে জাতির অতীত ঐতিহ্য রামায়ণ-মহাভারত বারংবার চর্চিত হয়েছে। মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রামায়ণ কাহিনির পুনর্বিন্যাস করেন। মূল রামায়ণ কাহিনি থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও সমাজ মানসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ-রাবন-ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ প্রতিটি চরিত্রকেই নতুন রূপে গড়ে তুললেন। উনিশ শতকের নাট্য সাহিত্যেও এই পুরাণের অনুসৃতি লক্ষিত হয়েছে। পুরাণ চরিত্রকে আধুনিক জীবন বোধের সংমিশ্রণে নবরূপ দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহাভারতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক মানুষের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য অর্ন্তদ্বন্দ্ব, তা প্রকাশ করেন। 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যনাট্যে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। আধুনিক কালের লেখকেরাও পৌরাণিক কাহিনি থেকে উপাদান সঞ্চয়ন করে নতুনভাবে কাহিনি রচনা করেছেন, যদিও "মিথীয় কাহিনীগুলিকে যখন আধুনিক মানসিকতায় নিষিক্ত করে তাঁরা রচনা করেছেন, তখনও প্রাচীন ঐতিহ্যের অভিঘাতটিকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেননি।"(মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া/চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত/পৃ.৫) আধুনিক কবি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কবিতায় দেশ বিদেশের পুরাণকে নিজস্ব উপলব্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তই পুরাণ ভাবনায় পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণাময় জীবনের পটভূমিতে পুরাণ প্রসঙ্গকে প্রতীকী তাৎপর্য দিলেন। এমনকি চিরাচরিত প্রেমের শিল্পীত রূপ দিতে গিয়েও তিনি ব্যবহার করলেন পুরাণ প্রসঙ্গ - "তোমারে ভুলিব আমি; তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় / মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব।"(ভবিতব্য/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত/শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.২০) শুধু

রামায়ণ মহাভারতই নয় আদিম পুরাণের অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি লগ্নের Myth কে উপজীব্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যেই - "চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে . . . এই সব ঐশী কাল ভেঙে দিয়ে / নূতন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি / ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু অনুভব করেছিলে।"(মিথ পুরাণের ভাঙ্গাগড়া/চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, পৃ. ১০১) মিথীয় অনুষঙ্গ কে নতুন সময়ের সঙ্গে মিশিয়ে একটি নতুন মাত্রা দান করেন তিনি - "সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে / দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মতো ফুটে।"(মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া/চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, পৃ. ১০১) মহাকালের রথের চাকা এগিয়ে যায় তবুও মানুষের মজ্জায় মিশে থাকা পুরাণ ঐতিহ্য এমনিভাবেই যুগে যুগে ভাবনাকে গতি দান করে, হারিয়ে যায় না যেতে পারে না।

বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যে পালাবদল এসেছে বারংবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ ও তিরিশের দশকে বাংলা উপন্যাসে উৎকট আধুনিকতার প্রবাহ এসেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সংঘাতে এ যুগের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণ করার চেষ্টাতেই একদল লেখক দেহাশ্রয়ী বাস্তবতাকে সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত করলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বয়ং এই লেখকদলকে কল্লোল গোষ্ঠী নামে অভিহিত করেছেন। ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনস্তত্ত্ব এই পর্বের লেখকদের মনকে আকৃষ্ট করল সবচেয়ে বেশী। কল্লোল এল নতুন বাঁকের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই যুগ মূলত সংকট এর কাল। মধ্যবিত্ত জীবনের অর্ন্তদ্বন্দ্ব, সম্পর্কের ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নিঃসঙ্গতা যুদ্ধোত্তর পর্বে কথা সাহিত্যের বিষয়। মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যাকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নানাভাবে তুলে ধরেছেন। বস্তু জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রে যুবনাশ্ব' এর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর 'কয়লাকুঠি' পরিচিত গণ্ডীর বাইরে গল্পের পরিধি বিস্তৃত করে দিয়েছে। আর তাঁদেরই সঙ্গে এলেন জগদীশ গুপ্ত। বয়সে তাঁদের থেকে প্রায় পনের বছরের বড় হয়েও যৌন কুণ্ঠাহীন বৈজ্ঞানিক নির্মোহে গল্পগুলিকে করে তুলেছেন নির্মম। বুদ্ধদেব বসু যেসময় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন তখন বিশ্ব অর্থনীতি এক বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। কাহিনির সুরটি বাঁধা হয়েছে শারীরিক জগৎকে কেন্দ্র করে। সম্ভোগের চিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা, তাঁদের এই রিরংসা প্রবণতা ও যৌনবিদ্রোহের প্রকাশকে সমালোচক মহল ধিক্কার জানিয়েছে। মূল্যবোধের অবসান, হতাশা ও মানসিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙন, দারিদ্র্যের পীড়ন, নেতিবাচক সংশয়, উদ্ভ্রান্ত বিহ্বলতা ও রোমান্টিক স্বপ্ন সেদিনের তরুণ সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নিবন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন - "বর্তমান বাঙালীর চিন্তা ধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে যে তাদের সম্পূর্ণ disillusioment এসে গেছে। আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি। অন্ধ ভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই; আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালবাসা - এ তিনটি

জিনিষের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।"(Ref. কালের পুত্তলিকা/ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/পৃ.১৭৯) এ যুগের অবিশ্বাস আর অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে তরুণ লেখকেরা রবীন্দ্রবিরোধিতার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। এঁদের সমান্তরালে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন সাহিত্যক্ষেত্রে। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সময়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন কল্লোলের "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন" (Ref. কালের পুত্তলিকা পৃ. ১৮০)পরবর্তী দশকের মুখ্য লেখকদের প্রভাবিত করেনি। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাউকে বিষণ্ণ করে বিগত যুগের বিলীয়মান অস্তরাগ, কারও লেখায় প্রকৃতির কোলে পুর্নবাসন আবার কেউ বা পাঠককে পৌছে দেন উত্তরণহীন এক প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্ণ গহ্বরে। গ্রামজীবনের শিল্পী তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ গ্রামের নাড়ির সঙ্গে কখনো ছিন্ন হয়নি। তবে প্রবৃত্তির বাস্তব উপস্থাপনায় কল্লোলগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তারাশঙ্কর। আর মানবধর্মে বিশ্বাসী বিভূতিভূষণ গার্হস্থ্যজীবনের রূপকার। মানব প্রকৃতি আর ঈশ্বর এই তিন মিলেই জীবনের সমগ্রতা, সাহিত্যক্ষেত্রে এই তিনের মিলনক্ষেত্রই রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। কল্লোলের পাতায় লিখলেও নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, ছোটবকুলপুরের যাত্রী প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের দিশারী সংযোজন। উত্তর তিরিশ বা চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন সুবোধ ঘোষ। পূর্ববর্তী এঁদের সকলের থেকেই ঋণ সংগ্রহ করেছেন কিন্তু পদানুসরণ করেননি কারোরই। তাঁর লেখার কোন শিক্ষানবিসি পর্বও নেই। সাহিত্যিক হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই তিনি স্বতন্ত্র। আসলে অন্যান্য মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাইতে ভিন্নতর এক জগতের মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন, একারণে তাঁর রচনার জগতের বৈচিত্র্য অভূতপূর্ব। তিনি যে সমস্ত উপন্যাস, ছোটগল্প, ভারত প্রেমকথা এবং ইতিহাসকে ফিরে দেখতে গিয়ে 'কিংবদন্তীর দেশে' রচনা করেন তার প্রায় সবগুলিই তাঁর জীবন থেকে উঠে আসে। অর্থাৎ প্রতিটি রচনার যেমন লেখক বা সাহিত্যিক থাকেন সেই সাহিত্যিকের পেছনেও থাকে একটি ব্যক্তিজীবন। তাই সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র জানার আগে একবার ফিরে তাকাতে হয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের দিকে।

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের হাজারিবাগে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সুবোধ ঘোষ। হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে পড়ার সময় বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর সুবিশাল পুস্তক সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ পান। কিন্তু কলেজে পাঠক্রম শেষ করার আগেই জীবনসংগ্রামের তাগিদে তাঁকে বিভিন্ন ও বিচিত্র পেশা গ্রহণ করতে হয়। জানা যায় রোজগারের তাড়নায় তাঁকে যুবক বয়স থেকেই জীবনযুদ্ধে নেমে পড়তে হয়। দেহাতি বস্তিতে কলেরার টিকাদান, বাস কন্ডাক্টরি, সার্কাসের খেলোয়াড়, বেকারির ব্যবসা, অভ্রখনির ওভারসিয়রী প্রভৃতি নানাবিধ

বৃত্তি তাঁকে নিতে হয়েছিল। ১৯৪০ সালে এক যোগাযোগের ফলে আনন্দবাজার পত্রিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে সুবোধ ঘোষের দাদা ভাইয়ের জন্য একটি চাকরির অনুরোধ করলে আনন্দবাজার পত্রিকার ছাপাখানা 'গৌরাঙ্গ প্রেস' এ তাঁর জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা করে দেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগাযোগ ঘটে গেল। উত্তম ঘোষ তাই বলেছেন, "সুরেশচন্দ্র মজুমদার হয়তো - সম্পূর্ণ অজান্তে একটি সাহিত্য বনস্পতির অঙ্কুর বপন করেছিলেন।"(সুবোধ ঘোষ : বড় বিস্ময় জাগে/উত্তম ঘোষ, পৃ.২৮) মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে তিনি নিজের দক্ষতায় আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুতরাং সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের পরিচয় নেবার আগেই সাংবাদিক সুবোধ ঘোষের পর্বটিকেও জেনে নেওয়া দরকার। 'কালপুরুষের সাত পাঁচ' আনন্দবাজার পত্রিকার জনপ্রিয় কলম। কালপুরুষ ছদ্মনামে জীবনের নানা দিককে ভাষা দিয়েছেন তিনি। নেফা অঞ্চল পরিভ্রমণ ও 'ভারতের মিলিটারী সায়েন্স' সম্পর্কে পড়াশোনা এবং কাশ্মীর ও নেফা দুই এলাকা নিয়ে ভিন্নস্বাদের রির্পোট পাঠক শ্রেণীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সম্পাদক সাগরময় ঘোষের। মূলত সুবোধ ঘোষ সাহিত্যিক এবং সাগরময় ঘোষ সাংবাদিক, তা সত্ত্বেও দুই দিকপাল লেখকের যোগসূত্র বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনে দিল। 'সেদিনের আলোছায়া' প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ সামান্য কথা ব্যয় করে জানিয়েছেন তাঁর লেখক হয়ে ওঠার পেছনে কাহিনিটি। জীবনের সংক্ষিপ্ততম অংশে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন - "লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না।. . . হঠাৎ দরকার হয়েছিল, তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম।"(সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৮৯) আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত মন্মথনাথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, প্রমুখ সাংবাদিক এর প্রয়াসে চল্লিশের দশকে এক পাক্ষিক সাহিত্য আলোচনা চক্র 'অনামী সঙ্ঘ' নামে গড়ে উঠেছিল। পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে ঐ সঙ্ঘের বৈঠকী সমাবেশ হত। সুবোধ ঘোষ নিজের কোন লেখা পাঠ না করলেও প্রতি সমাবেশেই উপস্থিত থাকতেন। একদিন হঠাৎই আসরে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেন, "সাহিত্যের মতো করে লিখতে পারুন বা না পারুন যা ইচ্ছা হয় এবং যা পারেন, যেমন তেমন কোন একটা নিজের লেখা অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আপনাকে পড়তেই হবে।"(সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯০) - এই ঘোষণায় কিছুটা লজ্জিত হয়েই সুবোধ ঘোষ পরের আসরের জন্য লিখলেন একটি গল্প,'অযান্ত্রিক'। গল্পটির জন্ম ইতিহাস বলতে গিয়ে তাঁর সেদিনকার অনুভূতিকেও তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে - ". . . পড়া শুরু করলাম। আধ ঘন্টারও কম। পাঠ শেষ। কয়েক মিনিট স্তব্ধতা। আমি রুদ্ধবাক, বিচারের রায়ে কী শাস্তি বিধান হবে জানি না। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রশংসার জলোচ্ছ্বাস। আজও মনে পড়ে সেই গুঞ্জন ধ্বনি।. . . অনামী বন্ধুদের সুপ্রীত চিত্তের সেই হর্ষধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই, তাঁদের দুই চোখের সেই উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির দৃষ্টি

আজও আমার স্মৃতির মধ্যে যেন একটি দ্যুতিচ্ছবির মতো মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। অনামী বন্ধুদের আন্তরিক প্রকাশ ও উৎসাহবাণী আমার সাহিত্যিক কৃতার্থতার প্রথম মাঙ্গলিক ধান দূর্বা।" (সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯০)— হঠাৎ লিখে ফেললেও সাহিত্যিক হয়ে ওঠার একটি গভীর অন্তঃপ্রেরণা বহুদিন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মন গড়ে উঠেছিল, কারণ বাইরের জীবন তাঁকে টানত অল্প বয়স থেকেই। বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে এবং জীবনে চলার পথে পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে যে আগুন জ্বলে সে আগুনের ফুলকিটুকু তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর লেখায়। তাই তাঁর ছোটগল্প - উপন্যাসের চরিত্ররা কেউ বা সাঁওতাল পরগনার আদিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ, কেউ ধর্মান্তরিত ওঁরাও মুন্ডা, কেউ বিহার - পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের খনির শ্রমিক, আবার কেউ বা চাকরী প্রত্যাশী বাঙালী মধ্যবিত্ত। এ সম্পর্কে লেখক স্বয়ং মন্তব্য করেছেন - "... না, আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্বিত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।"(সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯০) পাহাড়, জঙ্গল, নদী - তাঁকে বরাবরই টেনেছে নিজের কাছে। মাত্র আঠাশ বছর বয়সেই তাঁর কর্ম জীবনেও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটেছে।

ছোটবেলা থেকেই বারংবার বাড়ির বাইরে চলে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন বিশ্বসংসারকে, মানবপ্রকৃতিকে। কলকাতা থেকে শিলং যাবার সঙ্গী করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে। দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে আচমকাই নেমে গেলেন কাটিহারে। মাঝপথে এভাবে নেমে যাবার যথাযথ কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না সঙ্গী নীরেন্দ্রনাথ। ঠাঠা রোদ্দুরে মাইল দেড়েক পথ হেঁটে একটি গাছতলায় খাঁটিয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রকাশ করলেন প্রকৃত সত্য - "কী জানিস, ট্রেন থেকে এই জায়গাটা দেখে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল। তা আরও তো খাটিয়া রয়েছে, তুই-ও বরং শুয়ে পড়।"(সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/ভরাথাক : সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ) প্রকৃতিকে উপভোগ করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বলেই মাঝপথে যাত্রা ভঙ্গ করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। এমন মুগ্ধ প্রেমিক বলেই জীবনকে তিনি তফাৎ থেকে কিংবা সাময়িক আবেগের বশে দেখেননি। দেখেছেন কাছ থেকে, জীবনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তিনি শুধুমাত্র গল্প উপন্যাসই লেখেননি। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধও রচনা করেছেন। ভারতীয় রাজনীতির নানা বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল প্রখর। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক জনযুদ্ধ নীতি ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত অনামী সঙ্ঘের যে কয়জন লেখক সে যুগের 'প্রগতি সঙ্ঘে'র শিল্পী সাহিত্যিক নীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন সুবোধ ঘোষ ছিলেন তাঁদের একজন। যে 'অগ্রণী' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'ফসিল' প্রকাশিত হয়, সেটি সে যুগের ছোট কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন

উৎসাহী সমর্থকের চেষ্টায় প্রকাশিত। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে তিনি কমিউনিস্টদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তা বোঝা যায় প্রথম গল্প রচনার জন্ম ইতিহাস থেকেই। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর যে সকল সদস্য অনামী সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত এমনকি, আনন্দবাজার তখনও পর্যন্ত কমিউনিজম বিরোধী শিবির হয়ে ওঠে নি। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিলেন, শুধু যোগ দেওয়াই নয় তৎকালীন সমাজ জীবনের নেতৃত্ব গান্ধীজীর জীবন ও মতাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধী জীবনের ব্যাখ্যাতা হলেন। প্রাক্‌স্বাধীনতা কালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত আন্দোলন তারই জোয়ারে গা ভাসিয়ে তিনি লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি', 'একটি নমস্কারে', 'গঙ্গোত্রী' ও 'কালাগুরু', 'কর্ণফুলির ডাক' বা 'শিবালয়ে'র মত গল্প। আরো পরবর্তীকালে কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে সাহিত্যেও রাজনীতির প্রসঙ্গকে এড়িয়ে চললেন। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট - প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতির মিথ্যাচার ও অসঙ্গতিতে ব্যথিত ভারাক্রান্ত সুবোধ ঘোষ নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। লেখক হিসেবে তাঁর অন্যরকম পরিচয় পাওয়া গেল। বিচিত্র ও বিস্তৃত পথ পরিভ্রমণের ইঙ্গিত মেলে তাঁর গল্প ভুবনে। সমাজের সর্বস্তর থেকে উঠে আসা চরিত্র ও কাহিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রধান উপাদান। ভৌগোলিক সীমানারও বিস্তৃত রূপ এসেছে তাঁর রচনায়। প্রধানত কলকাতা শহর ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল - তার মধ্যে রাঁচি হাজারিবাগ - গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চল এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান এসেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। শুধু অঞ্চলটিই নয়, তিনি যখন রচনা করেন বা গড়ে তোলেন কোন শিল্প তখন তিনি যেন ঐ বিশেষ অঞ্চলের জনজীবন এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংগ্রহ করেন সাহিত্যের রসদ। তাই 'শতকিয়া' উপন্যাস এর দাশু-মুরলী যেমন জীবন্ত রূপ পায়, তেমনি সত্য হয়ে উঠেছে মধুকুপি অঞ্চল, ঐ অঞ্চলের কানারানী ও ডরানীর স্রোত। ছেলেবেলা থেকেই শালবন, পাহাড় আর জংলী ঝরনা নদীর সঙ্গে মেলামেশায় লেখক জীবনে একটি মহৎ আনন্দের সঞ্চয় হয়, 'সেদিনের আলোছায়া' অংশে এ অনুভূতির উল্লেখ করেছেন তিনি -"সে আনন্দের মধ্যে যে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা নিহিত ছিল, তার পরিচয় বয়স না বাড়বার আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরনা-নদীকে চমৎকার এক রহস্যের মায়াচ্ছবি বলে বোধ হতো।... ওয়াডসোয়ার্থের কবিতা পাঠ করবার ও তার অর্থ বোঝবার অনেক আগেই অনেকদিন ও অনেকবার মনে হয়েছিল, শালবনের বাতাস আর ঝরনার নদীর শব্দ যেন কথা বলছে।"(সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯৭) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভবের আবেশ মনের কোথাও যেন সুপ্ত ছিল। শুকিয়ে যায়নি তেমন করে, রোদ বাড়লে ঘাসের শিশির যেমন শুকিয়ে যায়। সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে যে ঈশ্বর বিশ্বাস তাকেই তিনি লালন করেছেন বহুদিন পর্যন্ত। শেষ জীবনে তাঁর সাহিত্যকর্মের সাধ ঈশ্বর বিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তিনি বিশ্বাস করেন - "মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের সম্বল যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার

সুমহিম প্রেরণার অনুগত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি, নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে!" (সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯৮) - প্রকৃতি, জীব-জগৎ, পশু-পাখির প্রতি অর্ন্তনিহিত আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেন। লাল মোটর কোম্পানিতে কাজ করার সময় নাইট সার্ভিসে গিয়ে কুড়িয়ে পান একটি ব্যাঘ্র শাবক। 'বিলি' নাম দিয়ে তাকে নিয়ে আসেন হাজারিবাগের বাড়িতে। ভাত, ডাল, মাংস খেয়ে বিলি বড় হয়ে ওঠে। একটি বাচ্চা ছেলেকে আক্রমণ করায় বিলিকে কুসুমভা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু বিলি ফিরে এল তাঁদের কাছে, নিজের মুক্তিকে মিথ্যে করে দিল 'বিলি'। অগত্যা তাকে শহরের চিড়িয়াখানাতেই রাখা হল। চিড়িয়াখানায় বন্দীত্ব দশায় বিলির যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করলেন লেখক সুবোধ ঘোষ। তাঁর ভাইঝি পুতুলের কাছে লেখা চিঠিতে সে অনুভূতি প্রকাশিত হয়। চিঠির আকারে লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে উঠেছে এবং এটি তাঁর শিশু সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। জীবনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে ষাটের কাছাকাছি বয়সে লেখক হঠাৎ আবার জীব জগতের সঙ্গে মানব জগতের বিচিত্র সম্বন্ধ নিয়ে গল্প রচনা শুরু করেন। গল্পগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নয়, এর স্বাদ অনেক বেশী Serious, 'তিনপাহাড়ীর বুড়ো বট', 'জগোমতির পাহাড়ী ময়না', 'হরেণবাবুর হরিণী মেয়ে', 'মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি', ইত্যাদি গল্পের মধ্যে বিলির জীবনের গল্পের মূল Spirit টি পাওয়া যায়। কিপলিং এর 'অ্যানিম্যাল স্টোরিজ' এর ধাঁচে এই গল্পগুলি তিনি লিখেছেন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষায়, "আমাদের চারপাশের জড় ও জীব প্রকৃতিকে একটি মহাগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি যে, জীবনের যে পর্বে তিনি কথাশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তার আগেই সেই গ্রন্থখানি তিনি আদ্যন্ত পড়ে নিয়েছিলেন।"(সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/ভরা থাক : সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ)

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি তিনি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শণ। কয়েকটি Picture Post Card থেকে জানা যায় লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, জার্মানী ও হামবুর্গ শহরে নিতান্তই ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেও তিনি মাটিতে মিশে যেতে দেননি। জীবনকে ও পৃথিবীকে নিবিড় করে দেখার আগ্রহ তাঁর শৈশব থেকেই। পঞ্চাশোত্তর স্থিতিশীল জীবনযাত্রায় এসেও সেই আগ্রহ ও উন্মাদনা অটুট ছিল। এই দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের পর যখন তিনি দুর্গম নেফা অঞ্চল ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন এবং নেফা'র পটভূমিতেই রচনা করেন 'জিয়াভরলি' উপন্যাস।

শিল্পী সত্তার আত্মবিকাশের বিচিত্রকথাতে সুবোধ ঘোষের জীবনকথা পরিপূর্ণ। বিচক্ষণ অনুধাবনের পাশাপাশি আত্ম-আবিষ্কার করেন। পুরাণের বা ধ্রুপদী বিষয়ে নিবিষ্ট সুবোধ ঘোষ রচনা করলেন

'ভারত প্রেমকথা'। বাংলা সাহিত্যে এ এক নব সংযোজন। পুরাণকে ব্যবহার করে নানা বিষয়ই এর আগে রচিত হয়েছে কিন্তু 'ভারত প্রেমকথা'য় পুরাণের উপাদানকে ভেঙ্গে চুরে নতুন রূপে নির্মাণের শৈলীটি একেবারে অভিনব। শুধু পুরাণ নয়, ইতিহাসের অতীত লোকে অবগাহন করেও জীবনের এক একটি দিককে তিনি তুলে এনেছেন। আসলে জীবনদর্শনের এমন এক উপলব্ধি তাঁর ছিল যাকে বলা যায় লৌকিকতা - অলৌকিকতার সহাবস্থানের একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় সম্যক বিশ্বাস। সীমার মাঝে অসীমের আপন সুরের ব্যঞ্জনাকে রবীন্দ্র প্রতিভা মধুর করে ভাবতে পেরেছিল। সুবোধ ঘোষও লিখেছেন - "ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ভালবাসার আবেগ ওষ্ঠপুটের রক্তিমা আরো নিবিড় করে তোলে - এই সব নিতান্ত লৌকিক সত্যের রূপ দেখে কেউ মুগ্ধ হ'তে পারত না যদি এর মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়েরও প্রকাশ না থাকত।"(সেদিনের আলোছায়া/সুবোধ ঘোষ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড/পৃ.৫৯৮) - অবশ্য এই লেখকের মননশীলতাই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা করেছিল, বস্তুবাদী কল্লোলের লেখকদের থেকেও অন্য গোত্র দিয়েছিল। বাস্তবের ফটোগ্রাফার তিনি নন, কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্যকে তিনি একাকার করে দিয়েছেন।

কল্লোলের আন্দোলনের পাশাপাশি তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন যুগের দাবি মেটাতে। চলমান যুগের সার্থক কাহিনিকার হিসাবে খ্যাত হলেন। আর চল্লিশের দশকে, যে সময় কলকাতা তথা ভারতবর্ষের যুগান্তরের কাল সেই পর্বে যাঁরা লেখনী ধরলেন সুবোধ ঘোষ তাঁদের অন্যতম। তাঁর সমকালে সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ। এই সব তরুণ লেখকেরা এগিয়ে চলেছেন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা - এ সবের মধ্যে পা ফেলে। ঐ অস্থির দিন সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন - "সেসব দিনের কথা ভোলা যায় না। তখনকার জীবন তো গল্পের মত ছিল না, দিনে দিনে তখন দিন বদলাচ্ছে, নাটক ঘটে সারা দেশের বুকে, সমাজে, মানুষের মনের মধ্যে। খবরের কাগজে তখন বড় বড় হরফে যুদ্ধের খবর, বোমা, ইভাকুয়েশন, বিয়াল্লিশের বিপ্লব, মন্বন্তর: একটার পর একটা।. . . কিন্তু আমাদের মনের ওপর যা কিছু চাপ রেখে যায় তা মনের ভিতরটাকে আন্দোলিত করে স্থির হয়ে ডুবে যায় মনের গভীরে। কারণ মন তখন মগ্ন হয়ে আছে সাহিত্যের শান্ত দীঘিটিতে।" (Ref. কালের প্রতিমা/অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়/পৃ. ১৫০) - তবে বারুদের গন্ধের পাশেই বাগানের জুঁইফুলের গন্ধটুকু নিতে তাঁরা ভুলে যাননি। মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরোয়া দৈনন্দিনতার মধ্যে যে প্রেম, প্রীতি, কলহ, রাজনীতি, অর্থনীতির নিষ্পেশন এসব কিছুকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সুবোধ ঘোষ সাধারণ মধ্যবিত্তের ছাঁচ থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছিলেন বলেই মধ্যবিত্তের জীবনের নানা সীমাবদ্ধতা, ভদ্রসভ্য মুখোশের আড়ালে একাধারে সেই শ্রেণীর ভীরু ও স্বার্থপর রূপটি তাঁর গল্পে বারংবার উন্মোচিত হয়। তাঁর প্রেক্ষণ বিন্দুটিকে অনায়াসে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভাবমূর্তি থেকে স্থানান্তরিত করতে পারেন বলেই তাঁর রচনা কখনই বিশিষ্ট একটি শ্রেণীর প্রত্যাশা পূরণের দাবী নিয়ে আসে না।

ব্যক্তি জীবনে নিরন্তর পথ চলা এই ব্যক্তিত্বের কলম থেমেছে অনেক বারই। জানা যায়, ১৯৬২ তে 'জিয়াভরলি' লেখার পর প্রায় পাঁচ বছর তিনি কিছু লেখেন নি। এমনকি 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকাতেও তিনি পুজো সংখ্যায় লেখা বন্ধ করে দিলেন। সুদীর্ঘকাল স্তব্ধতার পর 'কালকেতু' উপন্যাসটি লিখে তাঁর কলম মৌনব্রত ভঙ্গ করেছিল। জীবনের শেষ দিকে তাঁর পথচলা শারীরিক কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে লেকটাউন - পাতিপুকুরের বাড়ির ছোট্ট বাগানটিতে। অতিরিক্ত ধূমপানের তীব্র কষাঘাতে প্রচন্ড শ্বাসকষ্টে তিনি লনের ঘাসে ঘাসে পা ফেলে হাঁটতেন ধীর পদক্ষেপে। চিন্তার জালে তাঁর নিজস্ব মানসজগতে পরিভ্রমণ করতেন তিনি, আর অনুভূতির জগতে জুটিয়ে নিতেন বহুবিচিত্র সঙ্গী সাথী। শেষজীবনে তাঁর সবথেকে প্রিয় সাথী ছিল তাঁর নাতনী নীরাজনা। সারাজীবন ধরে অক্লান্ত কর্মসাধনার মাঝে বিস্তর পড়াশোনা ও লেখালেখি করতেন। আনন্দবাজার অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করতেন আবার ফিরেও যেতেন তেমনি সময় মেনে। নিয়মিত সম্পাদকীয় লিখতেন, কিন্তু শেষদিকে সাহিত্যরচনায় নতুন করে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি প্রকাশক-সম্পাদকের অনুরোধও। মৃত্যুর কয়েকঘন্টা পূর্বে ১৯৮০, ১০ই মার্চ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর শেষ রচনা, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় 'ওমর খৈয়াম স্মরণে' লেখা কাগজটি পাঠিয়ে দিয়ে গেছেন। তারাশঙ্কর পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষের এই চলে যাওয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। যে সময়টা লেখকরা প্রাণের তাগিদে লিখতেন, অনেক বলবার কথা ছিল তাই উপন্যাস রচনা করতেন। যখন সাহিত্য পণ্য হয়ে ওঠেনি এবং পাঠকেরাও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে সাহিত্যকে গ্রহণ করতেন - সে যুগটা তো প্রকৃতই চলে গেল - সুবোধ ঘোষ যার শেষ দিকের অন্যতম প্রতিভূ।"(সুবোধ ঘোষ থাকবেন/তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/ভরা থাক : সুবোধ ঘোষ স্মৃতি তর্পণ) এমনই ছিলেন সুবোধ ঘোষ। একরকম খেলার ছলে গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন একবার সেই জগতে প্রবেশ করেন তখন তাতে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে যান এবং সেটিই হয়ে উঠে তাঁর বেঁচে থাকার অন্নজল, জীবনের একমাত্র আশ্রয়। বহুবিধ শাখায় যেন প্রায় Adventure প্রিয় পর্বতারোহীর মত বিচরণ করেছেন তিনি। রাজনীতি, রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যক্তিজীবন তাঁর সাহিত্যচর্চার বাইরে থাকে নি এমন এক ভিন্ন ধারার কথাকারকে নিয়েই আমাদের আলোচনা।